হিন্দু সংহতি

সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

প্রথম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, জুন ২০০৯, কলকাতা ✿ মূল্য ঃ ১.০০ টাকা

পাকিস্তানের দাবী মেনে নিলেই মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের পরিবর্তন ঘটবে না। অতীতে মুসলমানদের অনেক অন্যায় দাবী মেনে নেওয়া হয়েছে। তাদের অযৌক্তিক চাহিদার কোনও শেষ নেই।

—ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী

আমাদের কথা

এই রাজ্যে মুসলিম তোষণের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে। এবার আর তোষণ শুধু মুখের কথায় নয়। কাজে। ভারতের সংবিধানে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের কোনরকম সুযোগ না থাকলেও রাজনৈতিক দলগুলি ও সরকার মুসলিমদেরকে চাকরিতে কোন না কোন ভাবে সংরক্ষণ দেবেই। পড়াশোনার নামে তাদেরকে টাকা ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। সংবিধানে কোন ধর্মের জন্য আলাদা করে সরকারের দ্বারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা সম্পূর্ণ নিষেধ থাকলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতায় তিনটি কলেজের প্রভাত বিভাগ খুলতে চলেছে শুধু মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের জন্য। এবার ভোটে পরাজয়ের পর মুসলিম ভোট ফিরে পেতে সিপিএম কোন বড় রকমের পদক্ষেপ নিতে পারে। অর্থাৎ নাটুকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্থানে কোন মুসলমানকে মুখ্যমন্ত্রী পদে বসাতে পারে। তাহলেই ষোল কলা পূর্ণ হবে। আর মমতা ব্যানার্জী তো মুসলিম তোষণের রেকর্ড স্থাপন করবেন।

এই অবস্থায় মুসলিমদের অন্যায় আবদার, অযৌক্তিক দাবী আরও বেড়ে যাবে। এবং এর শেষ হবে আর একটি মুসলিমস্তান গঠনের মধ্য দিয়ে।

একথা পার্ক সার্কাসের হিন্দু, মেটিয়াবুরুজের হিন্দু আর জেলাগুলির হিন্দুরা বুঝতে পারছে। কিন্তু বুঝেও কেমন যেন অসহায়ের মত বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে পায়ের নীচের মাটি সরে যাওয়া। তবু কিছু করছে না। এর কারণ কি? গভীরভাবে এর কারণ খুঁজে বের করা দরকার।

আজ থেকে ১০০ বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ এর কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন। তা হচ্ছে এই হিন্দুজাতি ঘোর তামসিকতায় আচ্ছন্ন। তামসিকতার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে নিষ্ক্রিয়তা। তাই বিবেকানন্দ বলেছিলেন, সারা দেশে রজোগুণের বন্যা বইয়ে দিতে। মনে রাখতে হবে, দেবীর সামনে যখন পশুবলি দেওয়া হয়, তখন তমোগুণের প্রতীক হিসাবেই সেই পশুকে বলি

শেষাংশ দ্বিতীয় পাতায়

বর্ধমানে বুড়োরাজের মেলার যাত্রীদের উপর নির্মম অত্যাচার

গত ৬ ও ৭ জুন বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত ঐতিহ্যপূর্ণ জামালপুরের বুড়োরাজের মেলার তীর্থ যাত্রীরা নির্মম অত্যাচারের সম্মুখীন হল। বেশ কয়েকজন মৃত, ১০০-র বেশী আহত। বহু নিখোঁজ। পাটক্ষেতে বহু হিন্দু নারীর ইজ্জত লুণ্ঠিত। মৃতের সংখ্যা সঠিক জানা যাচ্ছে না। কারণ, আশঙ্কা করা হচ্ছে বেশ কিছু লাশ মাটির নীচে পুঁতে ফেলা হয়েছে। স্থানীয় মুসলিম গুণ্ডা পোষণকারী পূর্বস্থলী থানা ও উচ্চতর কর্তৃপক্ষ এই নৃশংস হিন্দু নিধনকে পুরোপুরি ধামা চাপা দিতে তৎপর।

জামালপুরের ঐতিহ্যমণ্ডিত বাবা বুড়োরাজের মন্দির

জামালপুরের বাবা বুড়োরাজের মন্দির আসলে শিব মন্দির। কিন্তু এই মন্দিরে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বলি হয়। দূর দূরান্ত থেকে হিন্দুরা, বিশেষ করে যাদব সম্প্রদায়ের বহু মানুষ এইদিন বাবার মন্দিরে এসে নিজ নিজ মানতের বলি দেয়। ঐদিন মন্দিরে কয়েক লক্ষ মানুষের সমাগম হয় যার মধ্যে যাদব সম্প্রদায় বা ঘোষেদের সংখ্যা বেশী থাকে। বহু মানুষের সমাগম উপলক্ষে এখানে মেলা বসে যাকে বাবা বুড়োরাজের মেলা বলা হয়। বর্ধমান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও মালদা জেলার ঘোষেদের কাছে ঐ মেলায় এসে বলি দেওয়া একটি অত্যন্ত পবিত্র ধার্মিক অনুষ্ঠান।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

সেদিন ছিল ৭ই জুন' ০৯ রবিবার। আনুমানিক সকাল পৌনে ৯টা। এই পৌনে ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ছাতনীর মোড়ে ঘটে গেল এক হিন্দু নিধন যজ্ঞ। একদল সশস্ত্র মুসলমান কিছু অপরিণামদর্শী হিন্দু যুবকের উৎসাহে ও সহায়তায় একদল তীর্থ যাত্রীর উপরে সামান্য কথা কাটাকাটির উপর আক্রমণ শুরু করে। এবং এলোপাথারী রামদা, বগি এবং চেলা কাঠ দিয়ে কোপাতে থাকে এবং মারতে থাকে। আক্রান্ত তীর্থযাত্রীরাও প্রাণ বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ লড়াই করে। তাদের হাতেও রামদা, বগি ইত্যাদি ছিল। কারণ তারা বাবার বাড়ী থেকে (বাবা বুড়োরাজ)

শেষাংশ দ্বিতীয় পাতায়

আইলা ত্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে হিন্দু সংহতি

গত ২৫ মে জোয়ারের জলের সঙ্গে আইলা তুফান সুন্দরবনের সমস্ত নদীবাঁধগুলিকে ভেঙ্গে গ্রামগুলিকে ছিন্নভিন্ন ও নোনাজল প্লাবিত করে দিল। নিমেষে লক্ষ লক্ষ মানুষের মাথার উপর থেকে চাল উড়ে গেল। মানুষ নিরাশ্রয় হয়ে পড়ল। জল ও তুফানের প্রকোপে শতাধিক মানুষ মারা পড়ল। বহু মানুষ পড়ল আটকা।

ঐ দিনই সন্ধ্যায় হিন্দু সংহতির দপ্তরে সন্দেশখালির বিভিন্ন গ্রাম থেকে ফোন এল—দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আবেদন জানিয়ে। পরের দিনই অর্থাৎ ২৬ মে সংহতির সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দে-র নেতৃত্বে তিনজনের প্রতিনিধি দল গেল সন্দেশখালি ব্লকের পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখে আসতে। ২৭ মে কলকাতায় জরুরীভাবে আহূত বৈঠকে স্থির হল ত্রাণকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ২৮ তারিখে হয় পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি। ২৯ তারিখে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে এক ম্যাটাডোর ত্রাণসামগ্রী নিয়ে কলকাতা থেকে ১০ জন ও মিনাখা সন্দেশখালির ৩০ জন কর্মী ঢুকে পড়ল সন্দেশখালি ১ নং ব্লকের জলরুদ্ধ গ্রামগুলিতে। প্রথমদিন ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে ছিল মাত্র ৫ কুইন্টাল চিঁড়ে, ৫ টিন গুড়, পানীয় জল শুদ্ধ করার জিওলিন, ও.আর.এস.-এর ১০০০ প্যাকেট, প্যারাসিটামল ও পেটের অসুখের জন্য ট্যাবলেট। তখনও পর্যন্ত ত্রাণের জন্য সংগঠনের কাছে আর্থিক সামর্থ্য ছিল খুবই সামান্য।

প্রথমদিনের পর থেকেই আর্থিক সহযোগিতা আসতে লাগল সংহতির দপ্তরে। ফলে তারপর থেকেই সন্দেশখালি ১ ও ২ নং ব্লক, হাসনাবাদ ব্লক,

শেষাংশ চতুর্থ পাতায়

৫৬-তম বলিদান দিবসে শ্যামাপ্রসাদকে শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বাধীন ভারতের প্রথম শহীদ, ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার প্রথম শহীদ, নেহেরু-শেখ আবদুল্লা যৌথ চক্রান্তের বলি প্রথম শহীদ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। বাংলা মায়ের এই বীর সন্তান শ্যামাপ্রসাদ ১৯৫৩ সালের ২৩শে জুন কাশ্মীরে গিয়ে শহীদ হলেন ভারতের অখণ্ডতা রক্ষায় 'এক বিধান, এক নিশান, এক প্রধান' শ্লোগান দিয়ে। শেখ আবদুল্লার কারাগারে শ্যামাপ্রসাদের এই সন্দেহজনক মৃত্যুর পর জহরলাল নেহেরু একটা তদন্ত কমিশনও গঠন করলেন না, শ্যামাপ্রসাদের মা শ্রীমতী যোগমায়া দেবীর আকুল আবেদন সত্ত্বেও। শ্যামাপ্রসাদ যে রাজনৈতিক দলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই জনসংঘ, যা পরে ভারতীয় জনতা পার্টি হয়েছিল, সেই দল ৬ বছর দিল্লীতে ক্ষমতায় থেকেও তারাও শ্যামাপ্রসাদের হত্যার ষড়যন্ত্র উন্মোচনের চেষ্টা করল না। নেতাজী অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচনেরও চেষ্টা ওরা করল না, পাছে নেহেরু পরিবারের অপকীর্তি প্রকাশ পায়।

শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন তাই পশ্চিমবঙ্গ ভারতে আছে। শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন তাই কাশ্মীর এখনও ভারতে আছে। শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন তাই আমরা বাঙালিরা এখনও ভারতে আছি। সেই ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মদিন ৬ই জুলাই ও বলিদান দিবস ২৩শে জুন। আজ হিন্দু সংহতি মুসলিম আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শ্যামাপ্রসাদের হিন্দু প্রতিরোধের আদর্শকে নিয়ে চলেছে। শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিন ও বলিদান দিবসে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

মুসলিম সংরক্ষণের আইলা থেকে পশ্চিমবঙ্গ বাঁচবে তো!

কয়েকদিন আগে পশ্চিমবঙ্গে আছড়ে পড়েছিল **"আইলা"**। আমরা যারা নিরাপদে আছি তারা দেখলাম একদিকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে লাল শালু টাঙিয়ে ত্রাণের ঢং, আর অন্যদিকে নড়বড়ে রাজ্য প্রশাসনের কঙ্কাল। অসহায় মানুষের 'পাশে থাকার' প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও খাদ্য নয় শুধু একটা পানীয় জলের জন্য ১৫ দিন পরেও চলছে দুর্গত মানুষের হাহাকার। প্রকৃতি সৃষ্ট, এই 'আইলা' না হয় আমাদের আয়ত্তের বাইরে। কিন্তু মনুষ্যসৃষ্ট যে 'আইলা' আসছে তার খবর রাখছেন কি?

সাম্প্রতিককালে বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একটু একটু করে 'আইলা' তৈরী হতে যে নিম্নচাপের সৃষ্টি করে চলেছেন সেটি হল শাসন ক্ষমতার স্বাদ পেতে বা তাকে ধরে রাখতে তাদের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান 73% হিন্দু সমাজ নয় কেবল 27% মুসলিম সমাজের নানাবিধ সংরক্ষণের ব্যবস্থা। রাজ্যে এ কাজে শাসক ও বিরোধীদলের মধ্যে চলছে নক্কারজনক প্রতিযোগিতা। তাই রেলমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় যখন মুসলিম সমাজের নানাবিধ সংরক্ষণের কথা বলেন তখন তাকে প্রতিহত করতে শাসক সিপিএমের নবতম সংযোজন মুসলিমদের সংরক্ষণে নতুন একটি কমিশন। যেহেতু দেশের সংবিধানে ধর্মীয় সংরক্ষণের কোন সুযোগ নেই, তাই মুসলিমদের অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত করে পিছনের দরজা দিয়ে তাদের শিক্ষা, চাকুরী, অনুদান, ব্যবসার জন্য টাকা ইত্যাদি নানাবিধ সংরক্ষণের সুযোগ দিতে চলেছে সি পি এম। মুসলিম সমাজ ওদের চোখের মণি আর অনগ্রসর, দুঃস্থ মেধাবি ছাত্র বা দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থানে ব্যর্থ হিন্দু সমাজ ওদের কাছে চোখের পিচুটি।

বিবেক বন্ধক রাখা বুদ্ধিজীবি বা ক্ষমতার ছড়ি ঘোরানো বা কামিয়ে নেওয়ার আশায় মেতে থাকা রাজনীতিবিদ নয়, সাধারণ পশ্চিমবঙ্গবাসী একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন উভয়ের এই মুসলিম তোষণ কি ভয়ংকর দিন ডেকে নিয়ে আসছে। এমনিভাবে না চাইতেই নানাবিধ সংরক্ষণ পেতে পেতে একটা সময় আসবে যখন ওরা আলাদা জাতি-আলাদা মাটির সংরক্ষণের কথা বলবে। ৪৭ সালের ইতিহাস তো সে কথাই বলে। অনুপ্রবেশের ফলে আজ অসমে ৭টি জেলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। আলাদা মাটির সংরক্ষণের 'আইলা' তাই আসবে অসমের মাটি থেকে, আর সেটা আছড়ে পড়বে আমাদের বাংলার মাটিতে। অপেক্ষা শুধু জিন্নার। ৪৭ সালে মুসলিম সমাজের এত নানাবিধ সংরক্ষণ ছিল না। তবুও সেদিন একটা জিন্না গান্ধী ও নেহরুর মত নেতৃত্বকে ধরাশায়ী করে আলাদা মাটি আদায় করে নিয়েছিল। আর আজ না চাইতেই শত শত সংরক্ষণ ও পশ্চিমবঙ্গের পাড়ায় পাড়ায় জিন্না। সর্বোপরি বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্ব তো গান্ধী নেহরুর তুলনায় কিছুই নয়। তাই তারা পারবে তো মুসলিম আগ্রাসনের 'আইলা' থেকে বাংলার মা, মাটি ও মানুষকে বাঁচাতে?

আগামী দুই মাস হিন্দু সংহতির সদস্য সংগ্রহ ও অর্থ সংগ্রহ অভিযানে অংশগ্রহণ করুন।

প্রথম পাতার শেষাংশ

আমাদের কথা...

দেওয়া হয়। তাই বাঘ, সিংহের পরিবর্তে ছাগল বলি দেওয়া হয় শুধু বাঘ-সিংহ ভয়ংকর বলে নয়। বাঘ-সিংহ রজোগুণসম্পন্ন, আর ছাগল তমোগুণ সম্পন্ন। তাই ছাগল বলি। অর্থাৎ তমোগুণের নাশ করে রজোগুণ সম্পন্ন না হয়ে কেউ সত্ত্বগুণের অধিকারী হতেই পারে না। তমোগুণ থেকে লাফিয়ে সত্ত্বগুণের অধিকারী হওয়া যায় না। তমোগুণ থেকে লাফিয়ে সত্ত্বগুণে যাওয়া যায় না। তামসিকতা থেকে রাজসিকতায় উত্তীর্ণ না হয়ে কেউ সাত্ত্বিক হতেই পারে না। সুতরাং নিষ্ক্রিয় ও কাপুরুষ ব্যক্তির পক্ষে সাত্ত্বিক বা সত্ত্ব গুণসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। সুতরাং সাত্ত্বিক হতে গেলে আগে রজোগুণ চাই। রজঃ সংবরণ নয়, রজঃসম্পন্ন হওয়া চাই। নিজের কাপুরুষতা ও নিষ্ক্রিয়তাকে ঢাকা দেওয়ার জন্য সাত্ত্বিক হওয়ার ভণ্ডামি হিন্দুজাতিকে শেষ করে দিচ্ছে। ভিখারীর বৈরাগ্য, নপুংসকের ব্রহ্মচর্য আর কাপুরুষের সাত্ত্বিক হওয়া একইরকম।

তাই যে ইসলামী আগ্রাসনের সুনামী পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের দিকে ধেয়ে আসছে, তাকে প্রতিহত করতে হলে চাই পৌরুষ, শৌর্য, বীর্য, উদ্যম। এসবই রজোগুণ। তাই হিন্দু সংহতির কর্মীদেরকে রজোগুণে ভরপুর হতে হবে। যাঁরা রজোগুণের নিন্দা করেন তাঁদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভুল। ভাগ্য ও ভগবানের উপর নির্ভর করে যারা নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকে তারাই তামসিক। এই তামসিকতা বিগত কয়েক শত বছর ধরে হিন্দু জাতিকে দাসে পরিণত করেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত হিন্দুরা লাথি ঝাঁটা খাবে, অত্যাচারিত, অপমানিত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সাত্ত্বিকতা বা সত্ত্বগুণের কথা মুখে আনাও পাপ। কারণ, সেটা ভণ্ডামি। আর ভণ্ডামিই পাপ।

চিন্তাশীল মানুষের মনের সঙ্গী চিন্তাবিদ
"শিবপ্রসাদ রায়ের"
অসাধারণ রচনাবলীর নতুন সংস্করণ।
অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে।
প্রাপ্তিস্থান
প্রকাশক ঃ তপন কুমার ঘোষ
চেতনা প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩
ফোনঃ২৩৬০-৪৩০৬, মোঃ৯৮৩০৫৩২৮৫৮
সব বুকস্টলকে আকর্ষণীয় হারে কমিশন দেওয়া হয়।

প্রথম পাতার শেষাংশ

বুড়োরাজের মেলার যাত্রীদের উপর অত্যাচার

পূজো দিয়ে বাড়ী ফিরছিল। বাবার বাড়ীতে পূজো দিতে গেলে বা বলি মানত থাকলে তাদের টাঙ্গী বগি রামদা নিয়ে আসতে হয়। এভাবেই আবহমান কাল থেকে এই প্রথা চালু আছে। সেই কারণে তাদের কাছেও কিছু অস্ত্রশস্ত্র থাকায় লড়াই করে তারা কোন রকমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

ঐ দলকে কব্জা করতে না পেরে স্থানীয় মুসলমানরা শতগুণ উৎসাহে এর পর পর আসা দলগুলিকে (তীর্থযাত্রী) আক্রমণ শুরু করে। হঠাৎ আক্রমণের ফলে অপ্রস্তুত তীর্থযাত্রীরা কোন রকমেই মোকাবিলা করতে পারেনি। তারা অসহায় অবস্থায় মার খেতে থাকে, চেলা কাঠ দিয়ে পিটানো, লোহার রড় দিয়ে মার, রামদা, বগি দিয়ে কোপানো এলোপাথারী চলতে থাকে। বাবার বাড়ী থেকে (বাবা বুড়োরাজ) ফিরে আসা যাত্রীরা ছাতনী মোড়ে আসা মাত্রই কিছু বুঝার আগেই আক্রমণের মুখে পড়ে যাচ্ছে। আর অহেতুক অকারণে মার খেতে হচ্ছে। মানুষের উপরে মানুষ যে এত নির্মমভাবে, এত নির্দয়ভাবে মারতে পারে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যারা এই হিন্দু নিধন যজ্ঞে অংশগ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে মোরশেদ সেখ, জাহির সেখ, রোহিত আলি সেখ, হান্নান সেখ, নজরুল সেখ, লম্বু সেখ, সোময় সেখ। আর এদের ঠাণ্ডা মাথায় পরিচালনা করে জহুরুল সেখ এবং খলিল মাষ্টার। প্রকৃত পক্ষে কত লোক যে নিধন হয়েছে বা কত লোক যে আহত হয়েছে আর কত লোক যে অপহরণ হয়েছে বা কত মা-বোনের যে ইজ্জত গেছে তার হিসাব এখনো দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ তারা এখানের কেউ নয়। তাদের বাড়ী মুর্শিদাবাদ জেলায়। তবে জানা যাচ্ছে তারা বেশীরভাগই বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার সুজাপুরের লোক। সুজাপুরের প্রকাশ ঘোষ নিহত, ১০জন আহত ও অনেক মহিলার ইজ্জত লুণ্ঠিত। কেবলমাত্র তারাই বলতে পারবে কত লোক নিখোঁজ হয়েছে।

দীর্ঘ দু ঘণ্টা তাণ্ডব চালানোর পর মুসলমানেরা জহুরুল সেখ এবং খলিল মাষ্টারের নেতৃত্বে রূপ পরিবর্তন করে নিল। হঠাৎই তাণ্ডব বন্ধ করে তারা চারদিকের রাস্তা অবরোধ করে দিল। সমস্ত বাড়ী ফেরা তীর্থযাত্রী বাস লড়ি আটকে গেল। মুহূর্তের মধ্যে প্রশাসনে খবর চলে গেলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রচুর সংখ্যক পুলিশসহ পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা এসে হাজির হয়ে গেলেন। তাদের সামনে মুসলমানরা বোঝাতে সক্ষম হলো যে ''তারা (মুসলমানরা) তীর্থযাত্রীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তারা বুড়োরাজের স্থান থেকে আসা ভ্যান ভাড়া দিচ্ছিলো না। ভাড়া চাইতে যাওয়ায় উল্টে মুসলমান ভ্যান চালককে রামদা দিয়ে কোপ মারে। এর পর আমরা (মুসলমান) প্রতিবাদ করতে যাওয়ায় আমাদেরকে আক্রমণ করে এবং আমাদের (মুসলমান) অনেকে আহত হয়েছে। .....ইত্যাদি.....ইত্যাদি। এখন আমাদের দাবি— মেলাতে যাতে অস্ত্রশস্ত্র না আসে ভবিষ্যতে তার ব্যবস্থা প্রশাসনকে করতে হবে। এই রকম একটা আশ্বাস পেলে আমরা অবরোধ তুলে নেবো।'' তারপর প্রশাসন ঐরকম পদক্ষেপ নেবে ভবিষ্যতে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর অবরোধ উঠে যায়। নিরুপায় এবং অসহায় হিন্দুরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো। তাদের কোন কথাই কাজে এলো না। প্রকৃত ঘটনাটা প্রশাসনকে জানাতে পারল না বা প্রশাসন প্রকৃত ঘটনাটা জানতেও চাইল না।

তাহলে প্রকৃত ঘটনাটা কী?

ছাতনী থেকে ৪ কি. মি. দূরে বাবা বুড়োরাজের মন্দির। এই মন্দিরে পূজো দেওয়ার জন্য সারা বছরে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর আসা-যাওয়া হয়। অনেক ভক্তের মানত-থাকে, তাই এখানে পাঁঠা বলিরও ব্যবস্থা আছে। পাঁঠা বলি দিতে যারা আসে তারা দলবল নিয়ে আসে এবং সঙ্গে টাঙ্গী বগি রামদা নিয়ে আসে। পাঁঠা বলি দিয়ে তারা আনন্দ করতে করতে বাড়ী ফিরে যায়। এই প্রথাই এখানে আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। বেশী তীর্থযাত্রীর ভিড় হয় বৈশাখী পূর্ণিমাতে এবং তার পরের পূর্ণিমাতে।

এবারের ঘটনাটির সূত্রপাত হলো ৬ই জুন শনিবার রাত ১২টায়। ঐ রাত ১২টার সময় একদল তীর্থযাত্রী (মুর্শিদাবাদের) বাবা বুড়োরাজের মন্দিরে অস্ত্রশস্ত্র সহকারে দলবল নিয়ে পাঁঠা নিয়ে যাচ্ছিল। ছাতনীর দক্ষিণ দিকে ফুলি পুরের কাছে সাঁওতাল পাড়ার কাছে মুসলমানেরা ঐ দলকে ঘেরাও করে অস্ত্রশস্ত্র কাড়তে যায় এবং মা-বোনেদের হাত ধরে টানাটানি শুরু করে। ঐখানে স্বাভাবিক কারণে বচসা বাধে। কিছু অস্ত্র তারা (মুসলমানেরা) কেড়ে নিয়ে যায়। তারপর তীর্থযাত্রীরা হুমকি দিয়ে যায় যে ''কালকে অর্থাৎ (৭ই জুন রবিবার) ফেরার পথে দেখে নেবো। তোদের চিনে রাখলাম। ঘটনাচক্রে পরের দিন যখন বাড়ী ফিরে যাচ্ছিলো ঐ তীর্থযাত্রীরা তখন হঠাৎ ঐ ব্যক্তিদের চিনে ফেলে। এবং তাদের সঙ্গে বচসা শুরু করে দেয়। এদিকে আগের দিন হুমকি দেওয়ায় তলে তলে মুসলমানেরাও প্রস্তুত হয়েছিল। বচসা করতে করতেই মুসলমানেরা হঠাৎই যাত্রীদের উপর আক্রমণ শুরু করে দেয় পূর্ব প্রস্তুতি অনুসারে। তার পরিণতি ছাতনীবাসী হতবাক হয়ে দেখলো। অপ্রস্তুত হিন্দুরা চোখের সামনে মৃত্যুপথযাত্রী, মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর একটি প্রাণীকেও উদ্ধার করতে পারল না বা কোন রকম প্রতিরোধ করতে পারল না। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাক্ষী হয়ে থাকলো।

অপরপক্ষে যে মুসলমানরা হিন্দুদের মারলো, তারা প্রশাসনের কাছে বোঝাতে পারলো যে তারা আক্রান্ত হয়েছে, তারা আহত হয়েছে, অতএব তাদের দাবি মানতে হবে। প্রশাসনও তাদেরকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করলো। এটা যে আগের দিনের ঘটনার জের- তা প্রচারে এলো না। প্রচারে অন্য ঘটনা (রিক্সাভাড়া) রটিয়ে বুদ্ধিমানের মত হিন্দুনিধন যজ্ঞ চালিয়ে গেল।

বুড়োরাজ মন্দিরে বলি দেওয়ার স্থান

শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধে তামিলদের পরাজয় ও বীরত্ব

তপন কুমার ঘোষ

শ্রীলঙ্কায় তামিলদের স্বাধীনতার সংগ্রাম দীর্ঘ ২৬ বছর রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর সমাপ্ত হল, এবং তা শেষ হল পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। শ্রীলঙ্কার তামিলদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী বহুদিনের। কিন্তু সেই দাবী আদায়ের জন্য 'লিবারেশন টাইগার অফ তামিল ইলম্' (LTTE) নামে গুপ্ত সংগঠন গড়ে তুলে তামিলদের সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয় ১৯৮৩ সালের ২৩শে জুলাই। শ্রীলঙ্কার উত্তর ও পূর্ব অংশে স্বাধীন তালিম ইলম্ (ভূমি) নির্মাণের জন্য শ্রী ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণের নেতৃত্বে এই গেরিলা সংগ্রাম শেষ হল ১৭ই মে ২০০৯ তারিখে প্রভাকরনের মৃত্যুতে। ঐ দিনই এল. টি. টি. ই. পরাজয় স্বীকার করে নিল।

২৬ বছরের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে এই পরাজয়ের পরিণাম সমগ্র তামিল জাতির পক্ষে ভাল হবে না খারাপ হবে— তা এখনই বলা কঠিন। কিন্তু এই যুদ্ধ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা খুবই দরকার।

এটা ছিল শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধ। তামিল জাতি ও সিংহলী জাতির মধ্যে। নাম থেকে মনে হতে পারে যে তামিলরা তো লঙ্কায় বহিরাগত। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। কারণ, রামায়ণের কাল থেকেই লঙ্কায় তামিলদের আগমন ও বাস। আর রামায়ণের কাল বহু হাজার বছর পুরানো। রামসেতুকে সাক্ষ্য ধরলে তো ১৭ লক্ষ বছর পুরানো। সুতরাং, ইতিহাসের এত ঊষাকালে যারা লঙ্কায় গিয়ে বসবাস শুরু করেছে, তাদেরকে কোনভাবেই বহিরাগত বলা যায় না। শ্রীলঙ্কায় তামিলদেরকে বহিরাগত বললে ভারতে মুসলমানরা অনেক অনেক বেশী বহিরাগত। সেক্ষেত্রে তাদের তো ভারতে কোন অধিকারই থাকা উচিত নয়। কিন্তু তবু তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও দেশবিভাগের দাবী ১৯৪৭ সালে আমাদের নেতৃবৃন্দ মেনে নিয়েছিলেন। এখানেই ভারতের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার তফাৎ।

শ্রীলঙ্কার এই ২৬ বছরের যুদ্ধে রক্তক্ষয় হয়েছে অপরিসীম, নিহত হয়েছে ৮০ হাজারের বেশী মানুষ। তারমধ্যে ২১ হাজার শ্রীলঙ্কার

লিবারেশন টাইগার্স অফ তামিল ইলম্ এর সেনাধ্যক্ষ ভেলুপিল্লাই প্রভাবকরণ

সৈন্য, এক হাজার পুলিশ, ১৫০০ ভারতীয় সৈন্য (রাজীব গান্ধীর আমলে), ২৭ হাজার তামিল সশস্ত্র যোদ্ধা এবং প্রায় ৩০ হাজার সিংহলী ও তামিল সাধারণ মানুষ। শ্রীলঙ্কার বিমানবাহিনীর প্রায় অর্ধেক বিমান ধ্বংস করে দিয়েছিল সশস্ত্র তামিল যোদ্ধারা যাদেরকে তামিল টাইগার বলা হত।

এই যুদ্ধে টাইগাররা অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়েছে। জাতির স্বার্থে প্রাণ উৎসর্গ করার হাজার হাজার উদাহরণ তৈরী করেছে। ভারতের ও সারা বিশ্বের তামিলরা এদেরকে সাহায্য করেছে। তামিল যোদ্ধারা শৌর্য, বীর্য ও সংকল্পশক্তির দৃঢ়তা দেখিয়েছে। এ সবগুলিই যে কোন জাতির পক্ষে গৌরবের।

কিন্তু এই গৌরব দিয়েও শেষরক্ষা হল না। হল শোচনীয় পরাজয়। কেন এমন হল? এ থেকে কি কিছু শিক্ষার আছে? নিশ্চয় আছে। প্রথম শিক্ষা হল নেতৃত্বের অপিরণামদর্শিতা। ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণ বীরত্ব দেখিয়েছেন। জাতির যুবসমাজ তাঁর নেতৃত্বে রক্ত ঢালতে কার্পণ্য করেনি। কিন্তু নেতা তাঁর জাতিকে জয়ের দরজায় এনে দিতে পারেননি। এর জন্য দায়ী তাঁর বা তাঁদের বীরত্ব নয়। এই পরাজয়ের প্রধান কারণ তাঁর গুপ্ত পথ। গুপ্ত পথের প্রধান খারাপ দিক হল এই যে, এই পথে জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে চলা যায় না। জনসাধারণের একটা বড় অংশকে নিজেদের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্বন্ধে ভাল করে বোঝানো যায় না। এবং এই গুপ্ত পথ অবলম্বন করলে প্রতিপক্ষের দমন নীতির বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমতের সমর্থনও হারিয়ে ফেলতে হয়। তাই নেতার উচিত, পথ সহিংস বা অহিংস যাই হোক না কেন, তা যেন জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে হয়। অর্থাৎ অত্যাচারীর দমননীতির বিরুদ্ধে গুপ্ত হিংসা নয়, গণ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এর কোন শর্ট কার্ট নেই। অন্যথায় বাঘা যতীনের মত শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীকেও জনসাধারণই পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয়।

বিশ্বে কিছু স্থানে গেরিলা যুদ্ধ সাফল্য পেয়েছে। যেমন নেপাল। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে নেপালে মাওবাদীরা সক্রিয়ভাবে প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীনের সাহায্য পেয়েছে, যে সাহায্য শ্রীলঙ্কার তামিল যোদ্ধারা ভারতের কাছ থেকে পায়নি। অর্থাৎ প্রভাকরণ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণেও ভুল করেছেন।

আমাদের বিশেষ করে মনে রাখা দরকার যে গেরিলা যুদ্ধ আর গেরিলা সংগঠন এক জিনিস নয়। গেরিলা যুদ্ধ জয় এনে দিতে পারে। কিন্তু গেরিলা সংগঠন দীর্ঘস্থায়ী পরিণাম দিতে পারে না। অনন্য যোদ্ধা শিবাজী অত্যাচারী মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে বার বার গেরিলা আক্রমণ করেছেন। কিন্তু তাঁর সংগঠন ও সেনাবাহিনী ছিল প্রকাশ্য ও নিয়মিত। তিনি গুপ্ত সংগঠন গড়ে তোলেন নি। অনেক মলিনতা, অনেক অস্বচ্ছতা, অনেক পাপ জমা হয় গুপ্ত সংগঠনে। সেই পাপ সেই সংগঠনকে সমূলে নষ্ট করে। আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনগুলির পরিণামও তাই হয়েছে।

তাই প্রকাশ্য সংগঠন ও প্রকাশ্য পথ অবলম্বন করতে হবে। গণ আন্দোলনের দ্বারা গণ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে অহিংসা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু গুপ্ত হিংসা অবশ্যই বর্জন করতে হবে। অত্যাচারী প্রতিপক্ষ যদি নির্মমভাবে হিংসা প্রয়োগ করে, তাহলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে হবে। বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, যদি হিংসার প্রয়োগ করতেই হয়, তাতে যেন জনসাধারণের স্বীকৃতি ও অংশগ্রহণ থাকে। অন্যথায় গুপ্ত হিংসা কোন সাফল্যই এনে দিতে পারবে না।

শ্রীলঙ্কার যুদ্ধে তামিলরা পরাজিত হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের মাথা নীচু হয়নি। যে বীরত্ব তারা দেখিয়েছে, তাদের আগামী বহু প্রজন্ম তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে, এবং স্মরণ করে তারা আত্মবলে বলীয়ান হবে। বীরত্ব, সাহস ও আত্মত্যাগের যে উদাহরণ এই তামিল যোদ্ধারা তৈরী করে গেল, তা থেকে তামিলরা তো লাভবান হবেই, সমগ্র হিন্দু সমাজ এ থেকে প্রেরণা গ্রহণ করতে পারে।

নির্বাচনী ফল ঃ কেন্দ্র ও রাজ্যে পরিণাম

অমল কুমার বসু

গত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ২০০-র বেশী আসন পাওয়ার পিছনে বরমাল্য যদি কাউকে দিতেই হয় তবে সেটা দিতেই হবে দেশবাসীকে। দীর্ঘদিন ভারতের মত বিশাল দেশে হাং পার্লামেন্ট ও পরিণামে জগাখিচুড়ি সরকারের অবসানের জন্য তাদের কাছে দুটি পথ খোলা ছিল। হয় বিজেপিকে সরকারে আনা নতুবা কংগ্রেসকে। গত চার বছর ধরে বিজেপি দলে আভ্যন্তরীন কলহ, পদলিপ্সা এবং সর্বোপরি দেশবাসীর আকর্ষণ সৃষ্টিকারী কোন কর্মসূচী না নেওয়া এ সবই চলেছে। নির্বাচনোত্তর সুধীন্দ্র কুলকার্নির প্রবন্ধ ও দল সঙ্ঘ পরিবারের নিয়ন্ত্রণ হারানোর আশংকা- সে সব কথাই প্রমাণ করে। সে যাই হোক দেশবাসী হঠাৎ দেখল বিরোধী দলের নেতা হিসাবে আন্দোলনবিমুখ বৃদ্ধ আদবানী দলের কথা চিন্তা না করে জীবনসায়াহ্নে এসে তাঁর জীবনের শেষ সুযোগটি কাজে লাগাতে অত্যন্ত স্বার্থপরের মত প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী। অতীত ইতিহাস যতই প্রোজ্জ্বল হোক বর্তমানের এই স্বার্থপর আদবানীকে তাই দেশবাসী প্রত্যাখান করেছে।

আদবানীকে প্রত্যাখ্যান করার মাশুল তাঁর দলকে গুনতে হয়েছে বলেই কংগ্রেসের ঝুলি ভরেছে। কারণ গত পাঁচ বছর কংগ্রেসের নেতৃত্বে U.P.A. সরকারের এমন কিছু গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল না যার জন্য তাদের এত সাফল্য। ভাল হোক মন্দ হোক একটিকে ত্যাগ করলে আর একটিকে মানুষ ধরবেই। কিন্তু কংগ্রেস দলের এই সাফল্যের পিছনে দল যে চাবিকাঠিটি ঘুরাচ্ছেন সেটি দলের আবার ভরাডুবি ঘটাবে বলেই মনে হয়। যে কংগ্রেস দল একদিন রাজা মহারাজা ও নবাবদের শাসন কেড়ে নিয়ে মানুষের শাসন দিয়েছিল। রাজন্যভাতা বিলোপ করেছিল তারাই আজ রাহুল গান্ধীকে রাজা আর সোনিয়া গান্ধীকে মহারাণী বানিয়েছে। ওই দুজন ছাড়া কংগ্রেস দলের আর সবাই কর্মচারী, এমনকি প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত। আমাদের প্রণব মুখার্জির নাকি অসীম ক্ষমতা ও বুদ্ধি। তিনি চেষ্টা করেছিলেন মিঠুন চক্রবর্তীকে জাতীয় শিরোপা দিতে। পারেন নি, কারণ দলের কোন পদে না থাকা প্রিয়াংকা বঢেড়া তা চাননি বলে। দলীয় আনুগত্যের নামে ব্যক্তি দাসত্বকে প্রতিষ্ঠা করে ইন্দিরা গান্ধী দলের সর্বনাশ করেছিলেন। সেই Tradition আজও চলছে বলে দলের বিপদ অনিবার্য্য। মনে পড়ে প্রধানমন্ত্রী নেহরু একবার কলকাতায় এসেছিলেন সরকারী কাজে। সবাই দেখা করতে এলেও কংগ্রেস দলের সভাপতি আসেন নি। তিনি তখন বর্ধমানের গ্রামে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে ধান ঝাড়ছেন। নেহরু ডেকে পাঠাতে পুলিশ জিপ নিয়ে সেই সভাপতিকে বর্ধমান থেকে তুলে নিয়ে এল রাজভবনে। না আসার কারণ নেহেরু জিজ্ঞাসা করায় ঐ সভাপতি উত্তর দিয়েছিলেন 'আপনি তো সরকারী কাজে এসেছেন, দলের কাজে নয়। যেদিন দলের কাজে আসবেন সেদিন অবশ্যই দেখা করব। (কষ্টকল্পিত— অতুল ঘোষ) বাংলায় তো বটেই সারা ভারতে এ রকম উত্তর দেওয়ার মতো নেতা ও কর্মী আছে কি? ভোগবিলাসের জীবন অক্ষুন্ন রাখতে এরা আজ সঠিক চিন্তা, সঠিক ভাবনার পরিবর্তে তোষামোদকারীর দলে পরিণত হওয়ায় এই বাংলাতেও দেখা গেল মানস ভুঁইয়ারা একবার জোট বিরোধী কথা বললেন আবার ঢোঁক গিলে জোটের প্রধান প্রবক্তা হয়ে গেলেন।

কিন্তু এ কি হল? কদিন আগেও যারা কংগ্রেসের নামে বিষোদগার করেছে সেই মায়াবতী মনমোহন সিংকে বলছে 'আমি তো তোমার বোন', লালুজী করজোড়ে কংগ্রেসের কাছে দপ্তরবিহীন মন্ত্রীর আবেদন করছেন। মেয়েকে মন্ত্রী করেছে বলে পি. এ. সাংমা সোনিয়া গান্ধীকে বলছেন 'তোমাকে বিদেশিনী বলে কত অপরাধ করেছি'। নির্বাচনোত্তর এই সব পরিস্থিতি ও কথাবার্তা আমাদের পরিষ্কার করে দিয়েছে কারা আমাদের রাষ্ট্রীয় নেতা।

এবার বাংলার কথায় আসি। এ রাজ্যে চেসেস্কুদের পতনের জন্য মমতা ব্যানার্জীর যেমন বরমাল্য পাওয়া উচিত, তেমনি প্রশ্ন হল মমতা ব্যানার্জী তাঁর সাফল্যের জন্য কাকে বরমাল্য দেবেন? অবশ্যই প্রকাশ কারাতকে। পরমাণু চুক্তি প্রশ্নে প্রকাশ কারাতেরা যদি কংগ্রেসকে ত্যাগ না করত তাহলে এই নির্বাচনেও CPM ও কংগ্রেস এক বৃন্তে দুটি কুসুম হয়েই থাকত। এমনকি নির্বাচনের পরও ফল ঘোষণার আগে পর্য্যন্ত কংগ্রেস দল সিপিএমের জন্য দরজা খুলে রেখেছিল। কিন্তু সিপিএমের সাহায্যের প্রয়োজন না হওয়ায় দিল্লীতে মমতা ব্যানার্জির গুরুত্ব বেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিপদও বেড়েছে। প্রথমত বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে গিলে খায় মমতাকেও সেভাবে গিলে খাবার চেষ্টা শুরু করেছেন সোনিয়া গান্ধী। আর যদি সেটা না হয় তবে জোট রেখেই কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা চলবে বলে জানিয়েছেন সোনিয়া গান্ধী। ফলে আজ যেমন বামফ্রন্টে থেকেও শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টায় সিপিএমের সাথে ফরওয়ার্ড ব্লক বা আর এস পি সংঘর্ষ হচ্ছে; তেমনি আগামী দিনেও কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য। আয়লা ত্রাণের সর্বদলীয় বৈঠকে তৃণমূলের বয়কট ও কংগ্রেসের যোগদান কি সেই ইংগিত দিচ্ছে না? সুতরাং অত্যাচারী সিপিএমকে হটানোর জন্য তৃণমূল অনুঘটকের কাজ করলেও তা কোনদিনই বাংলার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ হতে পারবে না। অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ভবিষ্যতে একটা বিরাট খালি স্পেস অপেক্ষা করছে। কোন জাতীয়তাবাদী শক্তি যদি এই স্পেসকে পূরণ করতে না পারে, তাহলে চীন অনুপ্রাণিত অতি বাম শক্তি এই জায়গাটি দখল করবে, যা হবে বাংলার জীবনে আর এক বিভীষিকা।

সন্দেশখালি ও গোসাবা ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে আইলা তুফান পীড়িতদের ত্রাণে অক্লান্ত হিন্দু সংহতির কর্মীরা

প্রথম পাতার শেষাংশ

আইলা ত্রাণে হিন্দু সংহতি

দঃ ২৪ পরগণা জেলার বাসন্তী, গোসাবা ও কুলতলি ব্লকের বহু গ্রাম ও দ্বীপে ত্রাণ নিয়ে যাওয়া হতে লাগল। ত্রাণ সামগ্রীতে চিঁড়ে-গুড়ের সঙ্গে যুক্ত হল গুঁড়ো দুধ, বিস্কুট, ব্লিচিং পাউডার, পানীয় জলের প্যাকেট, মুড়ি, মুড়কি ও নতুন জামাকাপড়। এছাড়া বড় ট্রলার নৌকা ভাড়া করে তার উপরেই খিচুড়ি রান্না করে গোসাবা ব্লকের বিভিন্ন দ্বীপে গিয়ে অবরুদ্ধ মানুষদের গরম খিচুড়ি খাওয়ানোর ব্যবস্থাও করল সংহতির ত্রাণকর্মীরা।

বাসন্তী ব্লকের সরকারী পি.এইচ.ই. দপ্তর থেকেও হিন্দু সংহতিকে ৩০০০ প্যাকেট পানীয় জল ও ব্লিচিং পাউডার দেওয়া হল। এই ত্রাণকাজে হিন্দু সংহতির সন্দেশখালি-১, মিনাখা ও বাসন্তী ব্লকের সোনাখালির ১০০-র বেশী কর্মী অদম্য উৎসাহে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে সকাল থেকে অধিক রাত পর্যন্ত কাজ করেছে। বহু কর্মীকে এই কাজে পাওয়া গেছে। বিভিন্ন এলাকায় ত্রাণ কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন পঙ্কজ কয়াল, রামকৃষ্ণ দাস, প্রদীপ মন্ডল, মৃত্যুঞ্জয় সাউ, অতনু পাত্র, সমীর গুহরায়, বিকর্ণ নস্কর, গৌতম হালদার, সোনালি নস্কর, যুধিষ্ঠির মন্ডল, প্রসেনজিৎ সাসমল প্রভৃতি কর্মীবৃন্দ। সমগ্র ত্রাণকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছেন উপানন্দ ব্রহ্মচারী, সুজিত মাইতি ও প্রকাশ দাস। চিকিৎসা কাজে প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করেছেন ডাঃ ধ্রুব মহাজন ও ডাঃ শুভঙ্কর বিশ্বাস।

২৯ মে থেকে ১২ জুন পর্যন্ত চলা এই আইলা তুফান ত্রাণ কাজে একদিন যোগাচার্য্য শ্রী রামদেবজীর পতঞ্জলি যোগ সমিতির সঙ্গে এবং একদিন কলকাতা বৈঠকখানা এলাকার 'আমরা সবাই ক্লাব'-এর সঙ্গে যৌথভাবে ত্রাণ দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে মোট ৬টি ব্লকে ৪২টি গ্রামে ১৮,০০০ মানুষকে ত্রাণ দেওয়া হয়েছে। ব্লক অনুসারে গ্রামগুলির নাম ঃ

সন্দেশখালি-১ ব্লকের কানমারি বাজার, শঙ্কর দহ, নলকড়া, নলকড়া ভাঙ্গিপাড়া। সন্দেশখালি-২ ব্লকের বেড়মজুর মাঝেরপাড়া, বেড়মজুর নতুনবাজার, ঝুপখালি, খুলনা, ঘোলাপাড়া, দঃ ভান্ডারখালি, পূঃ ভাণ্ডারখালি (রাউতপাড়া), চৌকিদার মোড়। হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের বৌঠাকুরাণী (নবীনপাড়া), বসুর মোড় (কলোনীপাড়া)। হাসনাবাদ ব্লকের হামগুড়া, শুলকুনি জেলেপাড়া, চক খাঁপুকুর, শুলকুনি বেলেপোতা, সুলকুনি পূর্বপাড়া, কালিবাড়ি, ঘুনি হাউলি পাড়া, বাঁশতলা। গোসাবা ব্লকের রাঙ্গাবেলিয়া উত্তরডাঙ্গা, সাতজেলিয়া ৪নং মিত্রবাড়ি, কাকমারি, লাহিড়িপুর, লাহিড়িপুর লাক্স বাগান, সাতজেলিয়া ১১ নং, রজতযুবিলী পাথরপাড়া, এনপুর নেতাজি সরদার পাড়া, ১৩ নং নারায়ণপুর, ১৩নং জেমস্‌পুর, রাঙাবেলিয়া, পাখিরালয়, সোনারগাঁ, বিজয়নগর, বিরাজনগর, সোনারগাঁ ৬ নং, বিরাজমণি, ছোট মোল্লাখালি। কুলতলি ব্লকের ভাষা বাজার।

এখনও কয়েকটি স্থানে ত্রাণকার্য করা হবে।

পাকিস্তানের কারখানায় হিন্দু কর্মচারীদের অবস্থা

পাকিস্তানের অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র করাচী শহরে নোভা ইন্ডাস্ট্রিজ নামে একটি কারখানায় চল্লিশ জন হিন্দু কর্মচারী কাজ করত। এরা সকলে করাচীর মারোয়াড়ী মহল্লা এলাকার বাসিন্দা এদেরই মধ্যে একজন ২২ বছর বয়সী জগদীশ কুমার। গত ৮ এপ্রিল ঐ কারখানার ভিতরেই অন্য মুসলিম কর্মচারীরা তাকে হত্যা করে। জগদীশ কুমারের সম্বন্ধে অভিযোগ, সে নাকি ইসলাম ধর্ম বিষয়ে অবমাননাকর কিছু উক্তি করেছিল। সেখানকার সংঘ্যালঘু কাউন্সিলর শ্রীরতন কুমার দি নিউজ পত্রিকাকে জানান জগদীশের হত্যার পরই থেকেই হিন্দু কর্মচারীদেরকে নিতে কারখানার গাড়ী আসেনি। তাদের মুসলিম সহকর্মীদের কাছ থেকে তারা জানতে পেরেছে যে জগদীশের ঐ হসলাম অবমাননাকর উক্তির পর কারখানা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কেউই জগদীশের বাড়ীতে সান্ত্বনা জানাতে যায়নি। হিন্দু কর্মচারীরাও তাদের সাপ্তাহিক বেতন নিতে কারখানায় যায়নি। তাদের আশঙ্কা কারখানায় গেলে তাদেরও অবস্থা জগদীশের মত হবে।

জগদীশের ভগ্নিপতি ওমপ্রকাশ বলেন, ''আমার শ্যালক হজরত মহম্মদের সম্বন্ধে কোন কটূক্তি করবে এটা কখনোই বিশ্বাস করা যায় না, আমরা সবাই হজরত মহম্মদকে শ্রদ্ধা করি। আমি নিশ্চিত যে জগদীশের সহকর্মীরা ব্যক্তিগত বেষারোষি কারনেই তাকে হত্যা করেছে''। ওমপ্রকাশ আরো জানান যে জগদীশ কারখানার একজন অত্যন্ত দায়িত্বশীল কর্মী ছিল। তাই কারখানা কর্তৃপক্ষ জগদীশের উপর ভার দিয়েছিল একদল কর্মীকে পরিচালনা করার। যাদের মধ্যে মুসলিম কর্মচারীও ছিল। জগদীশ আমাকে প্রায়ই বলত যে, ''তার কিছু মুসলিম সহকর্মীরা কিছুতেই মেনে নিতে পারত না যে তারা কোন হিন্দুর অধীনে থাকবে এবং তারা প্রায়ই জগদীশের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত।'' তাই এই পরিণাম।

[সূত্র ঃ টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ১৩।০৪।০৮]

গ্রেফতার হওয়া মাদানির হাত অনেক গভীরে

গত ৪ জুন লস্কর-এ-তৈবার ভারতে শীর্ষস্থানীয় পরিচালক মহম্মদ উমর মাদানি দিল্লীতে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়। পুলিশের জেরাতে মাদানি জানায়, ভারত ও নেপালে জেহাদী তৈরীর জন্য সে আরব দেশগুলি থেকে প্রচুর পরিমাণ টাকা পায়। দিল্লী পুলিশের স্পেশাল সেল তার মাত্র একটা ব্যঙ্ক এ্যাকাউন্টের হদিশ পেয়েছে, তাতে ২০ লক্ষ নেপালি টাকা জমা আছে। সে নেপালে মাদ্রাসা পরিচালনার নামে সৌদি আরবের বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রচুর টাকা পেত। সেই টাকা সে ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত জেহাদী কার্যকলাপ চালনার কাজে লাগিয়েছে।

পাকিস্তানের অন্যতম জেহাদী সংস্থা জামাত-উদ-দাওয়ার প্রধান হাফিজ মহম্মদ সঈদ এর সঙ্গে উমর মাদানির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই হাফিজ মহম্মদ সঈদ ভারতে মুম্বাই ২৬/১১ জেহাদী আক্রমণের অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী। আন্তর্জাতিক চাপে পাকিস্তান সরকার হাফিজকে কিছুদিন গৃহবন্দী রেখেছিল। তারপরে ভারত সরকারের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছে। এখন দেখার যে দিল্লীতে গ্রেফতার হওয়া মহম্মদ উমর মাদানির জবানবন্দীর ভিত্তিতে ভারত জামাত-উদ্-দাওয়ার প্রধান হাফিজ মহম্মদ সঈদকে গ্রেফতার করে বিচারের জন্য ভারতে আনতে পারে কিনা। আমেরিকা তার নিজের সৈন্যদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য আফগানিস্থান ও পাকিস্তানের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় পাইকারি হারে জেহাদী তালিবান নিধন করলেও ভারতকে ক্ষত বিক্ষত করে চলেছে যে জেহাদীরা, তাদেরকে আমেরিকা স্নেহের দৃষ্টিতেই দেখে ও দেখবে। তাই মুম্বাই হামলার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী জামাত্-উদ-দাওয়ার প্রধান হাফিজকে পাকিস্তান ছেড়ে দিলেও আমেরিকা কিছু বলবে না। পাকিস্তানকে বরং তার আর্থিক সাহায্য বাড়িয়েই যাবে। আর ভারত আমেরিকার সামনে হাত জোড় করে থাকবে; এই হচ্ছে ভারতের বিদেশ নীতি। দেশে আর কত রক্ত ঝরলে, আর কত এলাকা হিন্দুশূন্য হলে ভারতের এই নেহেরু-বাজপেয়ী সুলভ নীতির পরিবর্তন হবে তা কে বলবে?

[সূত্রঃ টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ৫ জুন]

ইন্টারনেট সংবাদ

হিন্দু সংহতির ইন্টারনেট ওয়েবসাইট www.hindusamhati.org -এর দর্শকসংখ্যা নয় হাজার অতিক্রম করেছে। দর্শক সংখ্যার মধ্যে সর্বাধিক ভারতের। তার পরেই যথাক্রমে আমেরিকা, ইংলণ্ড, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, জার্মানী, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন দেশগুলি পর্যায়ক্রমে আছে। মোট ৮৮টি দেশের মানুষ এখনও পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটটি দেখেছেন। আমাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ প্রায় ১৬টি ইন্টারনেট ফোরাম ব্যবহার করে। সেগুলির দর্শকসংখ্যা এই নয় হাজারের অতিরিক্ত। অর্থাৎ, ইন্টারনেটে আমাদের সংবাদ লক্ষাধিক মানুষ পাঠ করে।

কর্মী প্রশিক্ষণ বর্গ

হিন্দু সংহতির কর্মী প্রশিক্ষণ বর্গ। ১০ - ১১ ও ১৩ - ১৪ জুন আমতা ও বনগাঁ মহকুমায় দুটি বর্গ অনুষ্ঠিত হয়। দুটি বর্গে মোট ৯০ জন যুবক উপস্থিত ছিল। দুটি বর্গেই সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রী চিত্তরঞ্জন দে ও সুজিত মাইতি ও মুকুন্দ কোলে উপস্থিত ছিলেন। আমতার বর্গের উদ্বোধনের দিন উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষ। সমাপনের দিন শ্রী অমল কুমার বসু উপস্থিত ছিলেন। বনগাঁর বর্গে দুদিনই উপস্থিত থাকেন শ্রী উপানন্দ ব্রহ্মচারী। এই বর্গে সংগঠন বিষয়ে বিভিন্ন দিক, কর্মীদের প্রশ্ন সহ সামাজিক সমস্যা ও তার সমাধানের দিক নিয়ে আলোচনা হয়।

''যে ধর্ম তার অনুগামীদের শিক্ষা দেয়, দস্যুবৃত্তি ও হত্যা ধর্মীয় কর্তব্য, পুণ্যের কাজ —সে ধর্ম মানব জাতির উন্নতির পরিপন্থী; বিশ্বশান্তির পক্ষে বিপজ্জনক''— বলেছেন প্রবাদপ্রতিম ঐতিহাসিক স্যার জে. এন. সরকার তাঁর ভবিষ্যদ্ বাণী আজ সত্য বলে প্রমাণিত। সারা পৃথিবী, বিশেষ করে খণ্ডিত ভারত আজ ইসলামি জেহাদে রক্তাক্ত, বিধ্বস্ত, বিপন্ন হিন্দু জাতির অস্তিত্ব। এর প্রতিকার কি? জানতে হলে পড়ুন।

তপন কুমার ঘোষ ও নিত্যরঞ্জন দাস রচিত

ধর্ম—ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলামি জেহাদ

প্রাপ্তিস্থান

তুহিনা প্রকাশনী

১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩
ফোনঃ ২৩৬০ ৪৩০৬, মোবাইলঃ ৯৮৩০৫৩২৮৫৮

প্রকাশক, মুদ্রক ও সত্ত্বাধিকারী প্রকাশ চন্দ্র দাস কর্তৃক ৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ চিত্তরঞ্জন দে
ফোন ঃ ০৩৩-২২৫৭ ২৬৮৮, ৯৪৩৩৪ ৫৩১০৯, ইন্টারনেট ঃ http://hindusamhati.blogspot.com, ই-মেল ঃ prokash.das@rediffmail.com